ENGR. KAUSHIK SAHA

TEACHING ASST. AT ISLAMIC University (IIUC)

Campus : STUDY ZONE , Gate NO: 07, Block:K,

Mobile: 01832221610

বিশ্বগ্রাম কী? গ্লোবাল ভিলেজ কি ?

বিশ্বগ্রাম হচ্ছে এমন একটি ধারণা যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষ একটি একক সমাজের ন্যায় বসবাস করবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে একে অপরের সাথে যোগাযোগ ও সেবা প্রদান করবে। অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্বকে বিশ্বগ্রাম বলা হয়।

বিশ্বগ্রামের এই ধারণা ১৯৬২ সালে ক্যানাডিয়ান দার্শনিক মার্শাল ম্যাকলুহান(Marchall Mcluhan) সর্বপ্রথম তার 'The Gutenberg Galaxy' বইয়ে উল্লেখ করেন। এই জন্য মার্শাল ম্যাকলুহানকে বিশ্বগ্রামের জনক বলা হয়।

বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠার উপাদানসমূহ কী কী ?

হার্ডওয়্যার, সফটওয়্যার, সফটওয়্যার, নেটওয়ার্ক বা কানেক্টিভিটি, ডেটা , মানুষের সক্ষমতা

ফ্রিল্যান্সিং কী?

কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে দীর্ঘস্থায়ী চুক্তি না করে, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে স্বাধীনভাবে নিজের দক্ষতা অনুযায়ী কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক কাজ করাকে বলা হয় ফ্রিল্যান্সিং।

টেলিমেডিসিন কী?

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে ভিন্ন ভৌগলিক দূরুতে অবস্থানরত রোগীকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, রোগ নির্ণয় কেন্দ্র, বিশেষায়িত নেটওয়ার্ক ইত্যাদির সমন্বয়ে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়াকে টেলিমেডিসিন বলা হয়।

ই-কমার্স কী?

ইলেকট্রনিক কমার্স বা ই-কমার্স একটি বাণিজ্য ক্ষেত্র যেখানে ইন্টারনেট বা অন্য কোন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয়/বিক্রয় বা লেনদেন হয়ে থাকে। কিছু ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এর উদাহরণ- alibaba.com, amazon.com, daraz.com.bd rokomari.com ইত্যাদি।

ই-কমার্স এর ধরণঃ প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। –

১। Business to Consumer (B2C) ২। Business to Business (B2B)

৩। Consumer to Business (C2B) ৪। Consumer to Consumer (C2C)

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী?

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হলো কম্পিউটার সিমুলেশনের সাহায্যে তৈরি ত্রিমাত্রিক পরিবেশ যা ব্যবহারকারীর কাছে সত্য ও বাস্তব বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক সময়ে অগমেন্টেড রিয়েলিটি (Augmented Reality) নামে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির একটি নতুন রূপ জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করেছে, যেখানে বাস্তব জগতের সাথে ভার্চুয়াল জগতের এক ধরণের সংমিশ্রণ ঘটানো হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ইতিহাস : ১৯৬২ সালে মর্টন এল হেলগি তাঁর তৈরি সেন্সোরামা স্টিমুলেটর নামক যন্ত্রের মাধ্যমে প্রথম ভার্চুয়াল রিয়েলিটির আত্মপ্রকাশ করেন।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির বৈশিষ্ট্য সমূহ কী কী ?

এই কৃত্তিম পরিবেশে ত্রি-মাত্রিক ছবি তৈরি হয়।, কৃত্তিম পরিবেশ হলেও অনুভূতি বাস্তবের মত। এই পরিবেশ তৈরির জন্য সংবেদনশীল গ্রাফিক্স ব্যবহার করতে হয়। কম্পিউটার প্রযুক্তি ও অনুকরণবিদ্যার (Simulation) প্রয়োগ করা হয়। ব্যবহৃত সফটওয়্যারগুলো – Vizard, VRToolKit, 3d Studio Max, Maya ইত্যাদি। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য, ইন্টারেক্টিভ, কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত, অন্বেষণযোগ্য এবং নিমগ্নযোগ্য হতে হবে।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি সিস্টেম তৈরির উপাদান গুলো কী কী ?

ইফেক্টর (Effector): ইফেক্টর হলো বিশেষ ধরণের ইন্টারফেস ডিভাইস যা ভার্চুয়াল রিয়েলিটি পরিবেশের সাথে সংযোগ সাধন করে। যেমন- হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে, ডেটা গ্লোভ, পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুট ইত্যাদি।

রিয়েলিটি সিমুলেটর (Reality Simulator): এটি এক ধরণের হার্ডওয়্যার যা ইফেক্টরকে সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করে। যেমন- বিভিন্ন ধরণের সেন্সর।

অ্যাপ্লিকেশন (Application): বিভিন্ন সিমুলেশন সফটওয়্যার সমূহ। যেমন- অটোডেস্কের "Division"।

জিওমেট্রি (Geometry): জিওমেট্রি হলো ভার্চুয়াল পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত তথ্যাবলী।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রকারভেদ:

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি দুই ধরণের।

1. টেলিপ্রেজেন্স (Telepresence)
2. সাইবার স্পেস (Cyberspace)

টেলিপ্রেজেন্স (Telepresence):

এই ধরণের ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহারকারীর সামনে দূরবর্তী কোন বাস্তব পরিবেশকে কৃত্রিমভাবে উপস্থাপন করা হয় এবং দূরবর্তী ঐ বাস্তব পরিবেশে একটি রোবট উপস্থিত থাকে। ভার্চুয়াল পরিবেশে ব্যবহারকারী যা করবে, দূরবর্তী স্থানের বাস্তব পরিবেশে অবস্থিত রোবট তার অনুকরণ করে কাজ করবে। এক্ষেত্রে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটারের গ্রাফিক্স ব্যবহারের মাধ্যমে দূর থেকে পরিচালনা করার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়, যাকে টেলিপ্রেজেন্স বলা হয়।

সাইবার স্পেস (Cyberspace):

এই ধরণের ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহারকারী বাস্তব অথবা কাল্পনিক পরিবেশে অবস্থানের অনুভুতি পায়। সিমুলেশনের ধরণ অনুযায়ী এটি বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে-

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ব্যবহার

- খেলাধুলা ও বিনোদন ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- ব্যবসা ও বাণিজ্যে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- শিক্ষা ও গবেষণায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- প্রকৌশল ও বিজ্ঞানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- যানবাহন চালানো প্রশিক্ষণে বা ড্রাইভিং প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- সামরিক প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- মহাকাশ অভিযানে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি
- প্রাত্যহিক জীবনে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাব

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির ইতিবাচক প্রভাব

১। শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেতে জটিল বিষয়গুলো ত্রিমাত্রিক চিত্রের মাধ্যমে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করা যায়। ২। ঝুঁকিপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থায় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি প্রয়োগ করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থা সহজ ও সরল করা সম্ভব। ৩। বাস্তবায়নের পূর্বে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে সিমুলেশনের মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উৎপাদন ব্যবস্থার

জটিল প্রসেসকে সরল করা যায়, প্রোডাক্ট ডিজাইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় করে কম খরচে উৎপাদন করা যায়। ৪। ঝুঁকিপূর্ণ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটির নেতিবাচক প্রভাব

১। বাস্তবের স্বাদ পাওয়ায় কল্পনার রাজ্যে বিচরন করতে পারে। ফলে এর প্রতি অনেকের মধ্যে আসক্তি তৈরি হয়। **২।** যেহেতু ভার্চুয়াল রিয়েলিটি একটি কম্পিউটার সিস্টেম তাই এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। **৩।** ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যয়বহুল হওয়ায় সবাই এই প্রযুক্তি ব্যবহারে সুবিধা পায় না। ফলে ডিজিটাল বৈষম্য তৈরি হয়।

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা কী ?

আর্টিফিসিয়াল(Artificial) অর্থ হলো কৃত্রিম এবং ইনটেলিজেন্স(Intelligence) অর্থ হলো বুদ্ধিমত্তা। অর্থাৎ আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স মানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। মানুষ যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেয়, কৃত্তিম উপায়ে কোন যন্ত্র যদি সেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তখন সেই যন্ত্রের বুদ্ধিমত্তাকে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা বলা হয়।

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার জনক কে ?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জনক হলেন বৃটিশ বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ অ্যালান টুরিং(Alan Mathison Turing)। ১৯৫০ সালে তার আবিষ্কৃত "টুরিং টেস্ট" কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ধারণার ভিত্তি স্থাপন করে।

কোনও মেশিন বা সফ্টওয়্যার জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো অর্জনের জন্য, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রয়োজন: গণিত, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নিউরন স্টাডি, পরিসংখ্যান

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগক্ষেত্র বা ব্যবহার:

এক্সপার্ট সিস্টেম, রোবোটিক্স, নিউরাল নেটওয়ার্কস, ইমেজ প্রসেসিং, মেশিন লার্নিং, ফাজি লজিক, ন্যাচারাল ল্যাংগুয়েজ প্রসেসিং(NLP) ইত্যাদিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করা হয়।

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা যেমন- LISP, CLISP, PROLOG, C/C++, JAVA ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শ্রেণিবিন্যাস

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে দু'টি আলাদা বিভাগে ভাগ করা যায়: দুর্বল(Weak) এবং শক্তিশালী(Strong)।

ANI, AGI, ASI

দুর্বল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Weak artificial intelligence): একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ডিজাইন করা একটি সিস্টেমে দুর্বল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ ভিডিও গেইম, দাবা, ব্যক্তিগত সহায়ক যেমন- অ্যামাজনের অ্যালেক্সা(Alexa) এবং অ্যাপলের সিরি(Siri) ইত্যাদি।

শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Strong artificial intelligence): শক্তিশালী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সিস্টেম হলো এমন একটি সিস্টেম যা মানুষের ন্যায় কাজগুলি পরিচালনা করে। এ সিস্টেমগুলো অধিক জটিল সিস্টেম। সিস্টেমগুলো এমনভাবে প্রোগ্রাম করা হয় যাতে কোনও ব্যক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া যেকোন সমস্যার সমাধান করতে পারে। যেমনঃ স্ব-ড্রাইভিং গাড়িগুলিতে বা হাসপাতালের অপারেটিং রুমগুলিতে এই ধরণের সিস্টেমগুলো ব্যবহৃত হয়।

এক্সপার্ট সিস্টেম কী ?

এক্সপার্ট সিস্টেম হলো কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন যা অসাধারণ মানব বুদ্ধির ন্যায় এবং দক্ষতার সাথে একটি নির্দিষ্ট জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তৈরি করা হয়।

নলেজবেজঃ এতে নির্দিষ্ট এবং উচ্চ মানের জ্ঞান থাকে। বুদ্ধি প্রদর্শনের জন্য জ্ঞান প্রয়োজন। যে কোনও ES এর সাফল্য মূলত অত্যন্ত নির্ভুল এবং সুনির্দিষ্ট জ্ঞান সংগ্রহের উপর নির্ভর করে।

এক্সপার্ট সিস্টেম এর ব্যবহার

১। রোগীর রোগ নিরাময়ে **২।** বিভিন্ন ডিজাইনের ভূল সংশোধনে। **৩।** জেট বিমান চালনায় ও সিডিউল তৈরিতে। **৪।** ভূগর্ভস্থ তেল অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ইত্যাদি।

বর্তমানে ব্যবহৃত বিভিন্ন এক্সপার্ট সিস্টেমসমূহ এবং তাদের কাজঃ

Deep blue: দাবা খেলার বিচারক হিসেবে কাজ করা।

Internist: চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান এবং নির্ভূলভাবে জটিল রোগের সার্জারি করা।

Mycin and Cadulus: চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান করা।

Mycsyma: গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা।

Dendral: প্রোগ্রামিং শেখানো।

Prospector: খনিজ পদার্থ ও আকরিক অনুসন্ধান করা।

রোবটিকস কী ?

প্রযুক্তির যে শাখায় রোবটের ডিজাইন, গঠন, পরিচালন ও প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, সেই শাখাকে রোবটিকস বলা হয়।

রোবট কী ? রোবট হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত এক ধরণের ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল যন্ত্র যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বা কোন ব্যক্তির নির্দেশে কাজ করতে পারে।

রোবটের উপাদান

প্রসেসর (Processor) : রোবটের মূল অংশ যেখানে রোবটকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রন করার একটি প্রোগ্রাম সংরক্ষিত থাকে। প্রসেসরসমূহ প্রোগ্রামকে রান করে থাকে এবং রোবটের সকল কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

পাওয়ার সিস্টেম (Power System): রোবটের যন্ত্রাংশগুলো পরিচালনার জন্য শক্তি প্রয়োজন হয়, তাই সকল রোবটের একটি পাওয়ার সিস্টেম থাকে। বর্তমানে লেড এসিড ব্যাটারি সর্বাধিক ব্যবহার হয়ে থাকে যা রিচার্জেবল। ফলে পুনরায় ব্যবহার করা যায়। এছাড়া সৌর শক্তি, বৈদ্যুতিক জেনারেটর, হাইড্রলিক সিস্টেম প্রভৃতি রোবটের শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ইলেকট্রিক সার্কিট (Electric Circuit) : ইলেক্ট্রিক সার্কিট বৈদ্যুতিক রোবটের মোটরসমূহে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে। এছাড়া হাইড্রোলিক ও নিউমেট্রিক সিস্টেমের রোবটকে নিয়ন্ত্রণকারী সলেনয়েড বা ভাল্বসমূহকেও বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদান করে।

অ্যাকচুয়েটর (Actuator) : রোবটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া করার জন্য বৈদ্যুতিক মটরের সমন্বয়ে তৈরি বিশেষ ব্যবস্থা হলো অ্যাকচুয়েটর। এটি রোবটের পেশিসদৃশ।

সেন্সর (Sensor): রোবটে প্রোগ্রামের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য পারিপার্শিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য আহরণ করার প্রয়োজন হয়। **মুভেবল বডি (Movable Body):** রোবটে চাকা, যান্ত্রিক পা বা স্থানান্তর করা যায় এমন যন্ত্রপাতি। যেমন- মটর।

ম্যানিপুলেটর (Manipulator) : রোবট তার পারিপার্শের বিভিন্ন বস্তুকে ম্যানিপুলেশন অর্থাৎ কোন বস্তু আকড়ে ধরা, সরানো, সারিবদ্ধ করা ইত্যাদি কাজের জন্য যেসকল অঙ্গ ব্যবহার করে, তাকে ম্যানিপুলেটর বলা হয়। যেমন- গ্রিপার, এফেক্টর ইত্যাদি।

রোবটের বৈশিষ্ট্য

১। রোবট সফটওয়্যার নিয়ন্ত্রিত যা সুনির্দিষ্ট কোন কাজ দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করতে পারে। **২।** রোবট পূর্ব থেকে দেওয়া নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করে। **৩।** রোবট বিরতিহীনভাবে বা ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করতে পারে। **৪।** রোবট যেকোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে কাজ করতে পারে। **৫।** এটি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরতে বা স্থানান্তরিত হতে পারে। **৬।** দূর থেকে লেজার রশ্মি বা রেডিও সিগন্যালের সাহায্যে রোবট নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রোবটের ব্যবহার

১। রোবটকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয় কম্পিউটার-এইডেড ম্যানুফেকচারিং এ, বিশেষ করে যানবাহন ও গাড়ি তৈরির কারখানায়।

২। যে সমস্থ কাজ করা স্বাভাবিকভাবে মানুষের জন্য বিপজ্জনক যেমন- বিস্ফোরক নিস্ক্রিয়করণ, ডুবে যাওয়া জাহজের অনুসন্ধান, খনি অভ্যন্তরের কাজ ইত্যাদি কঠোর শারীরিক পরিশ্রমের বা বিপদজ্জনক ও জটিল কাজগুলো রোবটের সাহায্যে করা যায়।

৩। সামরিক ক্ষেত্রেও রোবটের উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হচ্ছে বোমা অনুসন্ধান কিংবা ভূমি মাইন সনাক্ত করা।

PRESENTED BY
WITH KAUSHIK SIR

৪। কারখানায় কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত রোবটের সাহায্যে নানা রকম বিপজ্জনক ও পরিশ্রমসাধ্য কাজ যেমন- ওয়েল্ডিং, ঢালাই ,ভারী মাল উঠানো বা নামানো, যন্ত্রাংশ সংযোজন ইত্যাদির ক্ষেত্রে রোবট বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

৫। চিকিৎসাক্ষেত্রে জটিল অপারেশনে ও নানা ধরণের কাজে রোবট সার্জনদের সহায়তা করে থাকে।

৬। মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে রোবটের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মহাকাশ অভিযানে এখন মানুষের পরিবর্তে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বলিত রোবট ব্যবহৃত হচ্ছে।

ক্রায়োসার্জারি কী ?

গ্রিক শব্দ ক্রাউস(kruos) থেকে ক্রায়ো (Cryo) শব্দটি এসেছে যার অর্থ বরফের মতো ঠাণ্ডা এবং 'সার্জারি' অর্থ শৈল্য চিকিৎসা। ক্রায়োসার্জারি হলো এক ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতি যাতে অত্যধিক শীতল তাপমাত্রা প্রয়োগ করে শরীরের অস্বাভাবিক বা রোগাক্রান্ত কোষগুলোকে ধ্বংস করা হয়।

ক্রায়োসার্জারিকে অনেক সময় ক্রায়োথেরাপি বা ক্রায়োবায়োলেশনও বলা হয়।

ক্রায়োজনিক এজেন্ট কী ?

এই পদ্ধতিতে রোগাক্রান্ত অংশ হিমায়িত করা বা নির্দিষ্ট শীতলতায় পৌঁছানোর জন্য নিমোক্ত ক্রায়োজনিক এজেন্ট বা গ্যাসগুলো ব্যবহার করা হয়-

তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন গ্যাস, তরল অক্সিজেন, তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস,ডাই মিথাইল ইথাইল প্রোপ্রেন ইত্যাদি।

ক্রায়োসার্জারি যেভাবে কাজ করে

ক্রায়োসার্জারি বহিঃত্বকে যেভাবে কাজ করে: বাহ্যিক ক্যান্সার কোষ, তিল বা দাগের জন্য স্প্রেয়ার বা কটন বাড বা তুলার মাধ্যমে তরল নাইট্রোজেন অথবা আর্গন গ্যাস প্রয়োজনীয় স্থানে প্রয়োগ করতে হয়। ফলে ফুসকুড়ি তৈরি হয় যা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় ত্বক থেকে অপসারিত হয়। একই সাথে নতুন টিস্যু তৈরি হয়।

ক্রায়োসার্জারি অভ্যন্তরস্ত যেভাবে কাজ করে প্রথমে সিমুলেটেড সফটওয়্যার দ্বারা রোগাক্রান্ত কোষগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়।

পরবর্তীতে শরীরের অভ্যন্তরস্ত টিউমার বা রোগাক্রান্ত কোষের জন্য কাটাছেঁড়া ছাড়াই ইমেজিং যন্ত্রের(MRI,আলট্রা সাউন্ড) সহায়তায় ক্রায়ো সূচ অথবা ক্রায়োপ্রোবের মাধ্যমে ক্রায়োজনিক এজেন্ট রোগাক্রান্ত কোষে প্রয়োগ করা হয় । ফলে ১০-১২ সেকেন্ডের মধ্যে কোষের তাপমাত্রা -৪১ থেকে -১৯৬ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে আসে। তাপমাত্রা অত্যধিক হ্রাসের কারণে কোষের পানি জমাটবদ্ধ হয়ে ঐ টিস্যুটি বরফপিণ্ডে পরিণত হয়। বরফপিণ্ডে রক্ত ও অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধের কারণে টিস্যুটি মারা যায় ।

পূনরায় কোষের ভিতরে হিলিয়াম গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে তাপমাত্রা ২০ থেকে ৪০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে উঠানো হয়। ফলে জমাটবদ্ধ টিস্যুটির বরফ গলে যায় এবং মৃত কোষগুলো স্বাভাবিক শরীরগত প্রক্রিয়ায় তা ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে যায় ।

ক্রায়োসার্জারিতে আইসিটির ভূমিকা

১। সার্জারীর পূর্বে রোগাক্রান্ত কোষ বা টিস্যুর অবস্থান নির্ণয়ে MRI (Magnetic Resonance Imaging) বা আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়। ২। সমস্ত কার্যাবলী পর্যবেক্ষণের জন্য সারাক্ষণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। ৩। ক্রায়োসার্জারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় ডাক্তারদের অভিজ্ঞ করে তুলতে প্রশিক্ষণে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি ব্যবহার করা হয়। ৪। রোগীর তথ্য, চিকিৎসার গবেষণার ফলাফল ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য কম্পিউটার ডেটাবেজ সিস্টেম তৈরি করা হয়।

ক্রায়োসার্জারির ব্যবহার

মানব শরীরের ত্বকের উপরিস্থ বিভিন্ন ত্বকের ক্যান্সার চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি ব্যবহার করা হয় । ক্রায়োসার্জারি দ্বারা অভ্যন্তরীণ কিছু রোগ যেমন – যকৃত ক্যান্সার , প্রস্টেট ক্যান্সার , ফুসফুস ক্যান্সার , মুখের ক্যান্সার , গ্রীবাদেশীয় গোলযোগ , পাইলস ক্যান্সার , স্তন ক্যান্সার ইত্যাদির চিকিৎসাও করা হয়। মানবদেহের কোষকলার কোমল অবস্থা Planter Fasciitis এবং Fibroma ক্রায়োসার্জারির মাধ্যমে চিকিৎসা করা হয় ।

ক্রায়োসার্জারির সুবিধা

অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতির তুলনায় ক্যান্সার ও নিউরোসার্জারি চিকিৎসায় ক্রায়োসার্জারি অনেক সাশ্রয়ী। সার্জারী সম্পন্ন করতে সময় কম লাগে। ক্রায়োসার্জারির সুবিধা হলো এটি বারবার করা সম্ভব। অপারেশনজনিত কাটা-ছেঁড়ার কোনো জটিলতা নেই। এটি সাধারণ সার্জারির চেয়ে কম বেদনাদায়ক। রক্তপাত হয় না বললেই চলে, হলেও খুব কম। বহুল প্রচলিত কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপি এবং বিভিন্ন অস্ত্রোপচারের চেয়ে এই পদ্ধতির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কম। রোগীকে কোন পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয় না। রোগীকে হাসপাতালে থাকতে হয় না।

বায়োমেট্রিক কী ?

বায়োমেট্রিক হলো এমন একটি প্রযুক্তি যেখানে কোন ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয় অথবা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে অদ্বিতীয়ভাবে চিহ্নিত বা সনাক্ত করা হয়।

বায়োমেট্রিক পদ্ধতি কি?

অন্য ভাবে বলা যায়, বায়োমেট্রিক সিস্টেম হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা কোনও ব্যক্তির শারীরবৃত্তীয়, আচরণগত বা উভয় বৈশিষ্ট্যকে ইনপুট হিসাবে গ্রহণ করে, এটি বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃত ব্যবহারকারী হিসাবে ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে।

বায়োমেট্রিক সিস্টেম কীভাবে কাজ করে?

বায়োমেট্রিক সিস্টেম সনাক্তকরণ এবং যাচাইকরণের জন্য চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে –

১। প্রথমে কোন ব্যক্তির বায়োলজিক্যাল ডেটা ডিজিটাল কোড হিসেবে ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়। ২। পরবর্তীতে বায়োমেট্রিক ডিভাইস কোন ব্যক্তির বায়োলজিক্যাল ডেটা ইনপুট নিয়ে ডিজিটাল কোডে রুপান্তর করে। ৩। এই কোডকে ডেটাবেজে সংরক্ষিত কোডের সাথে তুলনা করে। ৪। যদি ডেটাবেজে সংরক্ষিত কোডের সাথে মিলে যায় তবে তাকে ডিভাইস সনাক্ত করতে সক্ষম হয়।

মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করে বায়োমেট্রিক সিস্টেমের প্রকারভেদঃ

শারীরবৃত্তীয় সিস্টেম (Physiological System):

১। ফিংগার প্রিন্ট রিকগনিশন সিস্টেম (Fingerprint Recognition system)

২। হ্যান্ড জিওমেট্রি রিকগনিশন সিস্টেম (Hand Geometry Recognition system)

৩। ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম (Facial Recognition System)

৪। আইরিস রিকগনিশন সিস্টেম (Iris Recognition System)

৫। রেটিনা স্ক্যানিং সিস্টেম (Retinal Scanning System)

৬। ডি.এন.এ (DNA) রিকগনিশন সিস্টেম (DNA Recognition System)

আচরণগত সিস্টেম (Behavioral System):

১। ভয়েস রিকগনিশন সিস্টেম (Voice Recognition System)

২। সিগনেচার ভেরিফিকেশন সিস্টেম (Signature Verification System)

৩। টাইপিং কীস্ট্রোক রিকগনিশন সিস্টেম (Typing Keystroke Recognition System)

ফিংগার প্রিন্ট রিকগনিশন সিস্টেম (Fingerprint Recognition system)

এটি বায়োমেট্রিক সিস্টেমে ব্যক্তি সনাক্তকরণের জন্য সর্বাধিক পরিচিত এবং ব্যবহৃত বায়োমেট্রিক সিস্টেম। ফিঙ্গার প্রিন্ট প্রাচীনতম এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় রিকগনিশন সিস্টেম।

প্রকৃতিগতভাবে প্রতিটি মানুষের আঙ্গুলের ছাপ বা ফিঙ্গার প্রিন্ট পৃথক থাকে। আঙ্গুলের পৃষ্ঠ, খাঁজ এবং রেখার দিক এর সমন্বয়ে ফিঙ্গার প্রিন্ট গঠিত। পৃষ্ঠের তিনটি মৌলিক প্যাটার্ন রয়েছে যথা: খিলান, লুপ এবং ঘূর্ণি আকৃতির। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর পাশাপাশি বিভাজন এবং দাগগুলো দ্বারা ফিঙ্গার প্রিন্টের স্বতন্ত্রতা নির্ধারিত হয়। ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার ফিঙ্গার প্রিন্টের ডিজিটাল ছবি তৈরি করে। তারপর কম্পিউটার ফিঙ্গার প্রিন্টের ডিজিটাল ছবিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচন করে বিশ্লেষণ করে এবং প্যাটার্ন-ম্যাচিং সফ্টওয়্যার ব্যবহার করে ডেটাবেজে সংরক্ষিত ফিঙ্গার প্রিন্টের নমুনার সাথে তুলনা করে কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে।

ফিঙ্গার প্রিন্ট রিডার এমন একটি বায়োমেট্রিক ডিভাইস যা কোনও ফিঙ্গার প্রিন্টকে ইনপুট হিসাবে নেয় এবং ডেটাবেজে সংরক্ষিত ফিঙ্গার প্রিন্টের নমুনার সাথে তুলনা করে।

সুবিধাঃ

১। খরচ তুলনামূলক কম। ২। সনাক্তকরণের জন্য সময় কম লাগে। ৩। এটি সবচেয়ে সমসাময়িক পদ্ধতি। ৪।অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং সুরক্ষিত। ৫। এটি মেমোরির জায়গা কম নেয়।

অসুবিধাঃ

১। আঙ্গুলে কোন প্রকার আস্তর লাগানো থাকলে সনাক্তকরণে সমস্যা হয়। ২। ছোট বাচ্চাদের জন্য উপযুক্ত নয়।

ব্যবহারঃ

১। কোন প্রোগ্রাম বা ওয়েবসাইটে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ডের পরিবর্তে আঙ্গুলের ছাপ ব্যবহার। ২। প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ । ৩। ব্যাংকিং পেমেন্ট সিস্টেমে।

হ্যান্ড জিওমেট্রি রিকগনিশন সিস্টেম (Hand Geometry Recognition system)

প্রতিটি মানুষের হাতের আকৃতি ও জ্যামিতিক গঠনেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। হ্যান্ড জিওমিট্রি পদ্ধতিতে মানুষের হাতের আকৃতি বা জ্যামিতিক গঠন ও হাতের সাইজ ইত্যাদি নির্ণয়ের মাধ্যমে মানুষকে সনাক্ত করা হয়। এই পদ্ধতিতে হ্যান্ড জিওমেট্রি রিডার হাতের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, পুরুত্ব, পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল, আঙ্গুলের দৈর্ঘ্য ও অবস্থান এবং সামগ্রিকভাবে হাড়ের কাঠামো ইত্যাদি পরিমাপ করে ডেটাবেজে সংরক্ষিত হ্যান্ড জিওমেট্রির নমুনার সাথে তুলনা করে ব্যক্তি সনাক্ত করে ।

সুবিধাঃ ১। ব্যবহার করা সহজ। ২। সিস্টেমে অল্প মেমোরির প্রয়োজন।

অসুবিধাঃ

১। ডিভাইস গুলোর দাম তুলনামূলক বেশি। ২। ফিংগার প্রিন্ট এর চেয়ে ফলাফলের সূক্ষ্মতা কম।

ব্যবহারঃ ১। এয়ারপোর্টের আগমন-নির্গমন নিয়ন্ত্রণ । ২। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবীদের উপস্থিতি নির্ণয়ে। ৩। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং লাইব্রেরিতে।

ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম (Facial Recognition System)

ফেইস রিকগনিশন সিস্টেমে মানুষের মুখের গঠন প্রকৃতি পরীক্ষা করে তাকে সনাক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর মুখের চোয়াল ও চিবুকের আকার-আকৃতি, চোখের আকার ও অবস্থান, দুই চোখের মধ্যবর্তী দূরত্ব, নাকের দৈর্ঘ্য এবং ব্যাস, চোয়ালের কৌণিক পরিমাণ ইত্যাদি তুলনা করার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে সনাক্ত করা হয়।

সুবিধাঃ

১। ফেইস রিকগনিশন সিস্টেম সহজে ব্যবহারযোগ্য। ২। এই পদ্ধতিতে সঠিক ফলাফল পাওয়া

অসুবিধাঃ

১। আলোর পার্থক্যের কারণে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ২। সময়ের সাথে সাথে মুখের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তিত হয় ফলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। ৩। স্বতন্ত্রতা গ্যারান্টিযুক্ত নয়, উদাহরণস্বরূপ, অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে। ৪। কোন ব্যবহারকারীর মুখ যদি হালকা হাসির মতো বিভিন্ন ভাব প্রকাশ করে তবে ফলাফলটি প্রভাবিত করতে পারে।

ব্যবহারঃ

১। কোন বিল্ডিং বা কক্ষের প্রবেশদ্বারে। ২। কোন আইডি নম্বর সনাক্তকরণে ।

আইরিস রিকগনিশন সিস্টেম (Iris Recognition System)

আইরিস রিকগনিশন সিস্টেমে মানুষের চোখের আইরিস প্যাটার্নের ভিত্তিতে কাজ করে। একজন ব্যক্তির চোখের আইরিস এর সাথে অন্য ব্যক্তির চোখের আইরিস এর প্যাটার্ন সবসময় ভিন্ন হয়। চোখের অক্ষিগোলকের সামনের লেন্সের ওপরে অবস্থিত রঙিন পর্দাকে আইরিশ বলে। আইরিস রিকগনিশন সিস্টেমে চোখের চারপার্শ্বে বেষ্টিত রঙিন বলয় বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করা হয়।

সুবিধাঃ

১। এটি অত্যন্ত নির্ভুল কারণ দুটি আইরিস মিলের সম্ভাবনা ১০ বিলিয়ন লোকের মধ্যে ১ জন।

২। আইরিস প্যাটার্নটি কোনও ব্যক্তির জীবদ্দশায় একই থাকে বলে এটি অত্যন্ত আদর্শ।

৩। ব্যবহারকারীকে চশমা বা যোগাযোগের লেন্স অপসারণ করতে হবে না; কারণ তারা সিস্টেমের নির্ভুলতার বাধা দেয় না। ৪। এটি সিস্টেমের সাথে কোনও শারীরিক সংযোগ থাকে না।

অসুবিধাঃ

১। আইরিস স্ক্যানার ব্যয়বহুল। ২। তুলনামূলকভাবে বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়।

৩। কোন ব্যক্তির সঠিক স্ক্যান করার জন্য তার মাথাটি স্থির রাখতে হয়।

ব্যবহারঃ

১। এই সিস্টেমটি পাসপোর্ট ছাড়াই বিদেশে যাওয়ার সুযোগ দেয়। ২। এছাড়া সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, মিলিটারি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতেও সনাক্তকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়। ৩। গুগল তাদের ডেটা সেন্টারে অ্যাক্সেসের জন্য আইরিস রিকগনিশন ব্যবহার করে।

রেটিনা স্ক্যানিং সিস্টেম (Retinal Scanning System)

রেটিনা হলো চোখের বলের পিছনের একটি আস্তরণ স্তর যা চোখের বলের ভিতরের পৃষ্ঠের 65% জুড়ে থাকে। এটিতে আলোক সংবেদনশীল কোষ রয়েছে। রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালীগুলির জটিল নেটওয়ার্কের কারণে প্রতিটি ব্যক্তির রেটিনা ভিন্ন।

রেটিনা স্ক্যানিং সিস্টেম

রেটিনা স্ক্যানিং সিস্টেমে একজন ব্যক্তিকে লেন্স বা চশমা অপসারণ করতে বলা হয়। 10 থেকে 15 সেকেন্ডের জন্য ব্যক্তির চোখের মধ্যে একটি নিম্ন-তীব্রতার ইনফ্রারেডেরের আলোক রশ্মি কাস্ট করা হয়। স্ক্যানের সময় রক্তনালীগুলো এই ইনফ্রারেড আলো শোষণ করে এবং একটি প্যাটার্ন গঠন করে । তারপর এই প্যাটার্নটি ডিজিটাইজড হয় এবং ডেটাবেজে সংরক্ষিত হয়।

সুবিধাঃ

১। সনাক্তকরণে খুবই কম সময় লাগে। ২। সনাক্তকরণে ফলাফলের সূক্ষ্মতা তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি। ৩। এটি একটি উচ্চ নিরাপত্তামূলক সনাক্তকরণ ব্যবস্থা যা স্থায়ী।

অসুবিধাঃ

১। এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। ২। তুলনামূলকভাবে বেশি মেমোরির প্রয়োজন হয়।

৩। ডিভাইস ব্যবহারের সময় চশমা খোলার প্রয়োজন হয়। ৪। কোন ব্যক্তির সঠিক স্ক্যান করার জন্য তার মাথাটি স্থির রাখতে হয়।

ব্যবহারঃ

১। এই পদ্ধতির প্রয়োগে পাসপোর্টবিহীন এক দেশের সীমা অতিক্রম করে অন্য দেশে গমন করা যেতে পারে যা বর্তমানে ইউরোপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২। এছাড়া সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, মিলিটারি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতেও সনাক্তকরণ কাজে ব্যবহার করা হয়।

ডি.এন.এ (DNA) রিকগনিশন সিস্টেম (DNA Recognition System)

Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) হলো জিনগত উপাদান যা কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত। প্রতিটি মানুষ তার ডিএনএতে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলো দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। DNA টেস্টের মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তিকে অত্যন্ত নিখুঁত ও প্রশ্নাতীতভাবে শনাক্ত করা যায়।

DNA যে কোন উৎস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যেমন- রক্ত, চুল, আঙুলের নখ, মুখের ত্বক, রক্তের দাগ, লালা এবং একবার বা দুবার ব্যবহার করা যেকোন জিনিস থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করা যায়।

সুবিধাঃ

১। পদ্ধতিগত কোন ভুল না থাকলে সনাক্তকরণে সফলতার পরিমাণ প্রায় শতভাগ।

অসুবিধাঃ

১। ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং তৈরি ও সনাক্তকরণের জন্য কিছু সময় লাগে।

২। ডিএনএ প্রোফাইলিং করার সময় পদ্ধতিগত ভুল ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং এর ভুলের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।

৩। সহোদর যমজদের ক্ষেত্রে ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং সম্পূর্ণ এক হয়।

৪। তুলনামূলক খরচ বেশি।

ব্যবহারঃ

১। অপরাধী সনাক্তকরণে ২। পিতৃত্ব নির্ণয়ে ৩। বিকৃত শবদেহ শনাক্তকরণে

বায়োইনফরমেটিক্স কী ?

বায়োইনফরমেটিক্স হলো একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় ক্ষেত্র যা অধিক এবং জটিল বায়োলজিক্যাল (জৈবিক) ডেটাসমূহ বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সফ্টওয়্যার বা টুলস তৈরি করে।

বায়োইনফরমেটিক্স বিজ্ঞানের এমন একটি আন্তঃশাস্ত্রীয় ক্ষেত্র, যেখানে কম্পিউটার বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, গণিত এবং ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞানকে ব্যবহার করে বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল (জৈবিক) ডেটাসমূহ বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করা হয়।

বায়োইনফরমেটিক্স এর প্রধান কাজ কী?

বিভিন্ন জৈবিক বিশ্লেষণের ফলে অধিক পরিমাণে ডেটা পাওয়া যায় এবং এই ডেটাগুলো ম্যানুয়ালি বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে সঠিক এবং দক্ষতার সাথে জৈবিক ডেটাগুলো বিশ্লেষণ করতে বিভিন্ন গাণিতিক কৌশল ব্যবহার করা হয়। সুতরাং, বায়োইনফরমেটিক্স, জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য ডেটা সায়েন্সের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। বায়োইনফরমেটিক্সে জীন তথা DNA সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ডেটাগুলো ডেটাবেজে সংরক্ষণ করা হয়।

বায়োইনফরমেটিক্সে ব্যবহৃত জৈবিক ডেটাসমূহ

ডিএনএ, জিন, এমিনো অ্যাসিড, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি

বায়োইনফরমেটিক্স এর জনক কে?

স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডোনাল্ড নুথ (Donald Knuth) সর্বপ্রথম বায়োইনফরমেটিক্সের ধারণা দেন।

বায়োইনফরমেটিক্স এর উদ্দেশ্য

১। প্যাটার্ন রিকগনিশন, ডেটা মাইনিং, ভিজুয়ালাইজেশন ইত্যাদির সাহায্যে জৈবিক প্রক্রিয়া সঠিকভাবে অনুধাবন করা। অর্থাৎ জীন বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান করে জ্ঞান তৈরি করা। ২। রোগ-বালাইয়ের কারণ হিসেবে জীনের প্রভাব সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করা। ৩। ঔষধের গুণাগুণ উন্নত ও নতুন ঔষধ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা করা।

একটি বায়োইনফরমেটিক্স টুলস তিনটি প্রধান কাজ করে থাকে:

১। ডিএনএ(DNA) সিকোয়েন্স থেকে প্রোটিন সিকোয়েন্স নির্ণয় করা ২। প্রোটিন সিকোয়েন্স থেকে প্রোটিন স্ট্রাকচার নির্ণয় করা ৩। প্রোটিন স্ট্রাকচার থেকে প্রোটিনের কাজ নির্ণয় করা

বায়োইনফরমেটিক্স এর ব্যবহার

Microbial Genome, Molecular Medicine , Personalized Medicine .Preventive Medicine . Gene Therapy , Comparative studies

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং কী ?

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো বিভিন্ন প্রযুক্তির সমন্বয় যার সাহায্যে কোষের জেনেটিক কাঠামো পরিবর্তন করে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উন্নত বা অভিনব জীব উৎপাদন করা হয়। জীব অর্থাৎ প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষুদ্রতম একক হলো কোষ। কোষের প্রাণকেন্দ্রকে নিউক্লিয়াস বলা হয়। নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিশেষ কিছু পেঁচানো বস্তু থাকে যাকে ক্রোমোজোম বলা হয়। ক্রোমোজোমের মধ্যে আবার চেইনের মত পেঁচান কিছু বস্তু থাকে যাকে DNA(Deoxyribo Nucleic Acid) বলা হয়। এই DNA অনেক অংশে ভাগ করা থাকে। এক একটি নির্দিষ্ট অংশকে জীন বলা হয়। এই জীন প্রাণী বা উদ্ভিদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বহন করে থাকে। অর্থাৎ প্রাণী বা উদ্ভিদের বিকাশ কীভাবে হবে, আকৃতি কীরুপ হবে তা কোষের DNA সিকোয়েন্সে সংরক্ষিত থাকে।

যেমনঃ ধরা যাক একটি আমের জাত উচ্চফলনশীল কিন্তু স্বাদে মিষ্টি কম। অপরদিকে অপর একটি আমের জাত কমফলনশীল কিন্তু স্বাদে অনেক মিষ্টি। এক্ষেত্রে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাহায্যে উচ্চফলনশীল আমের জিনের সাথে মিষ্টি আমের জিনের সংমিশ্রণে নতুন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন উচ্চফলনশীল ও মিষ্টি আম উৎপন্ন করা যায়।

অন্য ভাবে বলা যায়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ডিএনএ অপসারণ বা প্রবর্তন করে কোনও জীবের জিনগত কাঠামোর পরিবর্তন করে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, যাকে জেনেটিক মডিফিকেশন বা জেনেটিক ম্যানিপুলেশন বলা হয়, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ বায়োটেকনোলজি ব্যবহার করে কোনও জীবের জিনের সরাসরি ম্যানিপুলেশন বা পরিবর্তন করা হয় .জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তাকে রিকম্বিনেন্ট DNA (DeoxyriboNucleic Acid) – প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয়।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জনক কে?

১৯৭২ সালে Paul Berg বানরের ভাইরাস SV40 ও lambda virus এর DNA এর সংযোগ ঘটিয়ে বিশ্বের প্রথম রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ অণু তৈরি করেন। এই জন্য Paul Berg কে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর জনক বলা হয়।

রিকমবিনেন্ট DNA প্রযুক্তির ধাপসমূহ

১। DNA নির্বাচন

২। DNA এর বাহক নির্বাচন

৩। DNA খণ্ড কর্তন

৪। খণ্ডনকৃত DNA প্রতিস্থাপন

৫। পোষকদেহে রিকম্বিনেন্ট DNA স্থানান্তর

৬। রিকম্বিনেন্ট DNA এর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং মূল্যায়ন।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর ব্যবহার ও প্রয়োজনীয়তা

১। শস্যের গুণাগুণ মান বৃদ্ধি করা

২। শস্য থেকে সম্পূর্ণ নতুন উপাদান উৎপাদন করা

৩। পরিবেশের বিভিন্ন ধরণের হুমকি থেকে শস্যকে রক্ষা করা

৪। শস্যের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো

Made by,

ENGR. KAUSHIK SAHA

TEACHING ASST. AT ISLAMIC University (IIUC)

Campus : STUDY ZONE , Gate NO: 07, Block:K,

Mobile: 01832221610

PRESENTED BY PATHSHALA WITH KAUSHIK SIR